প্রগতিশীলতার সঙ্কট ও চেতনার বিপ্লব

দেবু

কুসংস্কার শব্দটি বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত, নানান ঢঙে, নানান অর্থে। বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্রুত উন্নতির সাথে সাথে আশা করা গিয়েছিল যে, এবার বুঝিবা অবৈজ্ঞানিক চেতনাগুলো লুপ্ত হবে ও যুক্তিনিষ্ঠ চেতনার বিকাশ ঘটবে। কিন্তু ততটা হয়নি। যতটা হতে পারত বা আশা করা গিয়েছিল। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠী আজও অশিক্ষা-কুশিক্ষা এমনকি নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত নয় আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা থেকে। চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার সাথে লড়াই করে এদের কোনরকমে টিকে থাকা। এদের মন-মননে রুটি-রুজির চিন্তা যতটা ক্রিয়াশীল , তার শতাংশের একাংশও নয় কুসংস্কার মুক্ত সুস্থ মনন চর্চায়। মুক্তবুদ্ধি চর্চা, বিজ্ঞানমনস্কতা - এসব শব্দগুলো তাদের কাছে ভারী ভারী দুর্বোধ্য শব্দ বই কিছু নয়। আবার ওরাই সমাজের মূল উৎপাদক শক্তি এবং একই সাথে বঞ্চিত শ্রেণী। একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি যে,এই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো থাকলে কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাসও থাকবে। সারি সারি উদাহরণও আছে এই বক্তব্যের স্বপক্ষে। এই জাতীয় অনুসিদ্ধান্তে একটা এড়িয়ে যাবার প্রবণতা আছে। তার মানে, আগে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টে যাক, তারপর কুসংস্কারমুক্তি আপনা আপনি আসবে। অর্থাৎ গোটা কাঠামোটা পাল্টে যাবার আগে কুসংস্কারমুক্তি বা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব শূন্য। কিন্তু গলদ আছে এই জাতীয় সিদ্ধান্তে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারে এই সমাজ কাঠামোর হাত আছে,স্বীকার করি, কিন্তু সমস্যা আরো অন্য জায়গায় আছে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে, সেই সর্ষেই হয়ত ভূত আছে। দেখা যাক না একটু।

আমাদের দেশে “প্রগতিশীল“ বলে পরিচিত একটা শ্রেণী আছেন। এরা প্রগতিশীলতার কথা বলেন,কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তির কথা বলেন,চেতনার বিপ্লবের কথা বলেন। বিপ্লব শব্দটি যেন জপমন্তের মত হয়ে গেছে। আপাদমস্তক পরিপাটি এই মানুষগুলো, যারা কিনা জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার রথী-মহারথী, তারা কতটা বাস্তবে প্রগতিশীল, কতটা কুসংস্কারমুক্ত এবং কতটা সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুভব করেন- এটা একটা বড় প্রশ্ন । কারণ যারা জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তাদের মধ্যেই যদি থাকে বস্তাপচা অবৈজ্ঞানিক চেতনা, তাহলে তা শংকার কারণই বটে। শিক্ষিত, সচেতন যারা পরিচিত, তারাতো নয়ই, এমনকি ভয়ানক নিরক্ষর, অজ্ঞ কেউও স্বীকার করতে রাজী নয় যে, সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন । মান যায় তাতে। কুসংস্কারকে ঘৃণা করেনা, এমন এমন একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষও পাওয়া মুশকিল। এর কারণ আছে। বহুল প্রচারে ও মগজ ধোলাইয়ে আমজনতা জেনেছে যে, কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে; কিন্তু জানেনি যে, কুসংস্কার আসলে কি। কেউ আর রাজী নয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভিধা পেতে। শব্দটি রীতিমত গালাগালি হয়ে গেছে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মহলে। হাটে-মাঠে-বাটে-জলসায়-পূজায়, জ্ঞানী-মূর্খ-পীর-মুরীদ-গুরু-শিষ্য নির্বিশেষে ব্যবহার করছে এই বর্ণময় শব্দটি। ছড়া কাটা বুড়ি থেকে শুরু করে শক্তিমান কবির মুখে উচ্চারিত ঐ শব্দটি আসলে কি?

কোন বড়সড় ব্যাখ্যা বা ভয়ানক কোন মারপ্যাঁচও কষার দরকার নেই এর মানেটা জানতে। অভিধান ও বিভিন্ন মতামত ঘাটলে কুসংস্কারের যে অর্থটি ঘুরে ফিরে আসবে, তাহলো, যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক ধারণা, অযৌক্তিক বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস, গোঁড়ামী ইত্যাদি। মোটামুটি অর্থে যেকোন বিশ্বাস বা সংস্কার, তা যতই নয়নাভিরাম হোক না কেন, তা যদি যুক্তিহীন হয়, অবৈজ্ঞানিক হয়, তা কুসংস্কারই। এর জন্য যদি খুব স্পর্শকাতর কোন স্থানে হাত লাগে, তবুও। তা না হলে বিচারটা একপেশে হয়ে যাবে। কিন্তু কথিত এই স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে স্পর্শ করা একটা সমস্যা বটে। এজন্য কতক সুবিধাবাদী মানুষ উপায় বাতলে দিয়েছেন।এরা বেশ ভালই মুখস্ত করেছেন বিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব। প্রথমে হিসাবে বসছেন যে, তিনি কোনগুলোকে কুসংস্কার বলে মনে করেন। মনমত একটা ফর্দ তৈরী করে এবার খুলছেন আইনস্টাইন-হকিং-গ্যালিলিও। খুব চিন্তাভাবনা করে হঠাৎ করে পেয়ে যাচ্ছেন তার ফর্দকৃত কুসংস্কারের সাথে জুড়ে দেবার মতো এক-আধটা অংক ও বিজ্ঞানের সমীকরণ, এরপর খানিক গাণিতিক কাঠিন্য এবং স্বকল্পনা মিশিয়ে ঝালমুড়ি পরিবেশন করছেন। এরপর সিদ্ধান্ত দিচ্ছে চন তৃপ্তির দন্ত মেলে, “যদিও মনে করা হত ঐটি কুসংস্কার, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অমুক থিওরী আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ঐটি একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত”। এভাবে আমরা দেখেছি গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে ভাগ্য পাল্টানো(?) পাথরের কি সব বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক; দেখেছি অষ্টধাতুর আংটির সাথে গ্যাষ্ট্রিক-আলসার-বাতের কি বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ! ভুত-প্রেত-জিনের তো বটেই এমনকি কোনদিন হয়ত ঘোড়ার ডিম, আকাশ-কুসুম, রামগরুড়ের ছানা, ব্যাঙের সর্দি ইত্যাদিরও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়ে যাব আমরা। এসব প্রমাণ-ট্রমাণ নিয়ে ডাহা ডাহা বইও লেখা হচ্ছে, চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে একটা বিভ্রান্তির ব্যাপার আছে। কারন, সব কিছুকে বিজ্ঞানসম্মত করার একটা হিড়িক শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞানের সমীকরণের মধ্যে ঢোকা সম্ভব নয়, এজন্য ফাঁকিটা বোঝাও সম্ভব হয়না প্রায় ক্ষেত্রেই। এই যে যেকোন কিছুকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমান করানোর একটা চেষ্টা বা প্রক্রিয়া, এটি হল নিছক অলঙ্করণের প্রক্রিয়া, প্রমাণের প্রক্রিয়া নয়। আগে ভাগেই সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে ঐটি কুসংস্কার নয়, তারপর বিজ্ঞান দিয়ে অলঙ্কৃত করা হচ্ছে। এই অলঙ্করণের দক্ষতায় অনেকে বড় বড় চিন্তানায়কও বনে যাচ্ছেন। অনেক বড় বড় নেতা, কবি-সাহিত্যিক-লেখক, শিল্পী, খেলোয়ার এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভাধর অনেক ব্যক্তিই এই বিজ্ঞানমিশ্রিত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মান্নাদের গান, রবিশঙ্করের সেতার শুনতে শুনতে যদি দেখি, অনামিকায় পাথর-রত্নের আংটি, আজহারউদ্দিনের ব্যাটিং-এর নান্দনিকতার পাশাপাশি যদি দেখি গলায় বেঢপ তাবিজ, তখন খটকা লাগে মনে। এতবড় বিখ্যাত মানুষ, সারা পৃথিবীর কত মানুষ ওনাদের চেনেন-জানেন, ওনারা কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন? এরকম ভেবেই খটকা লাগে। এর পাশাপাশি রাস্তায় টিয়া পাখির খাম টানা, বানর, শিকড়-বাকড়, অষ্টধাতু, দোয়া-তাবিজ, দেখলেই ঝটতি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেই যে, ওসব কুসংস্কার। এটা স্ববিরোধিতা। যা অবৈজ্ঞানিক অপ্রমাণিত, তা লাখ টাকা খরচ করে মন্ত্রী-টন্ত্রীরাই পরুন আর দু-এক টাকা খরচ করে অজ্ঞ-মূর্খ

মানুষরাই পরুন- তা কুসংস্কারই। এই স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত পক্ষপাত মানে না। আমাদের দেশে মহাজাতক নামক একজন মহাপরিচিত ব্যক্তির কাছে যারা মনের জোরে শূণ্যে ভেসে ওঠার থিওরী শুনতে যান, তারা বেশির ভাগই শিক্ষিত, সচেতন, স্বচছল। কুসংস্কারকে যত বেশি বিজ্ঞান দিয়ে অলঙ্কৃত করা হচেছ, ততই এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। গ্রহণযোগ্যতাকে আরও ক্ষতিকর ভাবে বাড়িয়ে দিচেছন কিছু কিছু বিখ্যাত মানুষ, যারা পেশাগত ভাবে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক হলেও ব্যক্তিজীবনে কুসংস্কারাচছন্ন। বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশেরই স্বনামধন্য সাহিত্যিককে কি আমরা দেখি না পরপর তিন কন্যা হবার পর এক পুত্র কামনায় পীরের দরবারে ধর্ণা দিতে? জন্ডিসে ডাক্তারও চলছে, হলুদ জল ধোয়াও চলছে, বাতের ব্যথায় ঔষধও চলছে, তামার বালাও চলছে। আমাদের আশেপাশেই তা বড় প্রগতিশীলদের মধ্যেই চলছে। সামাজিক অনিশ্চয়তা, দারিদ্র, বঞ্চনা এসব কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখতে সহায়তা করে বুঝা গেল, কিন্তু এসব প্রায় নিরুদ্বেগ জীবনযাপনকারী মানুষগুলোর ক্ষেত্রে জবাবটা কি হবে? এনারা ভালই বুঝেন যে, তাদের মতো প্রভাবশালী মানুষেরা যদি কুসংস্কার শোভিত থাকেন, তাহলে তা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে সমাজের বহুদূর পর্যন্ত চেতনাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু প্রশ্ন করলে উত্তর, "থাক না, ক্ষতি কি?" কি বিনয়সম্মত জবাব, "গুরুজন/ মা/ বাবা/ খালা/ ফুফু দিয়েছেন, ফেলি কি করে, কষ্ট পাবেন যে।" এখন এরা চিন্তায় ও বাস্তবে কতটুকু মিল রেখে চলেন, একবার ভাবুন। এরা কি প্রকৃতপক্ষে চান যে, জনচেতনা এগিয়ে যাক? মনে হয় এরা গুরুজনের দেয়া জিনিস- এই ধুয়োয় চারখানা বিবি, আটখানা মাদুলী, ষোলখানা চটি স্যান্ডেলও গলায় ধারণ করতে পারবেন।

কুসংস্কারকে নিয়ে কথা বলতে যেয়ে প্রায় সবাই-ই গাঁ বাঁচিয়ে কলম চালান, কথা বলেন, একটা বিষয়কে এড়িয়ে যাবার সচেতন চেষ্টা এখানে দৃষ্টিকটু। বিষয়টি হলো অধুনা পৃথিবীর একটি প্রচন্ড প্রভাবশালী বিষয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (Religion)। লেখালেখিতে সাবধানে কলম চালালে সমাজের কোন উপকার হোক না হোক, নিজে ধীরে ধীরে পন্ডিত বনে যাওয়া যায়, আখের গোছানো যায়। কিন্তু হাতে-কলমে কুসংস্কারমুক্তির কাজে নামলে এভাবে গাঁ বাঁচিয়ে চলা মুশকিল। কারণ, ধরা গেল আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরোধিতা করবেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মধ্যে থেকে এটা করা কতটুকু সম্ভব? হিন্দু ধর্মের চৌদ্দ শাস্ত্রের মধ্যে এক শাস্ত্র হলো জ্যোতিষশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের সঙ্গে অনেক দেব-দেবীর নাম ও ধর্মীয় কাহিনীও জড়িত। এজন্য শুধু অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে নাকচ করে দেয়া বা উপযোগহীনতার যুক্তিতে খুব একটা কাজ হবে না। কারণ গন্ধটা আসছে শাস্ত্র থেকে। আর অনেক ঋজু মেরুদন্ডও নুয়ে যায় শাস্ত্রের তথা ধর্মের তলে। এখানে বিচিছন্নভাবে আওয়াজ তোলা যাবে না যে, এই শাস্ত্র ভুয়া। ধর্মের অন্যান্য অযৌক্তিক বিষয় নিয়ে আপনি রা কাড়বেন না, অথচ তার একখানা শাস্ত্রকে মিথ্যা বলবেন, এ রকম বুদ্ধিতে শেষ পর্যন্ত কুসংস্কারমুক্তির ঝাঁপিই বন্ধ করতে হবে। দোয়া-কালাম, তাবিজ, পানিতে ফুঁ, এসবে কিছুমাত্র উপকার হয় না, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে এগুলো বিভিন্ন কিতাব থেকেই ধার করা। পীর-ফকির-দরবেশ জাতীয় চরিত্রগুলো এগুলো স্বদম্ভে চালাচেছন কি করে? ধর্মীয় তোল্লাই আছে বলেই চালাচ্ছেন। সাথে চালাকিও নেই, তা বলছি না। বাড়ি থেকে বের হবার সময় সুরা পড়ে বুকে ফুঁ, হারানো বস্তু ফিরে পাবার জন্য দোয়া আওড়ান, (একবার ফুটবলের বিশ্বকাপ ট্রফিটা হারিয়ে গিয়েছিল; ইস্, কর্তৃপক্ষের যদি দোয়ার খবরটা জানা থাকত!) শত্রুকে বশ করার জন্য, মামলায় জেতার জন্য, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দরগা-মাজার-মসজিদে ধর্ণা দেওয়া, এসবে ধর্মের হাতটাই স্পষ্ট। তাবড় তাবড় মানুষের কান্ডও এর চেয়ে কম যায় না। ভারতে নরসীমা রাওকে প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ নিতে দেখি তিথি নক্ষত্র দেখে, আমাদের দেশে ব্রীজের উদ্বোধন হচেছ মোনাজাত করে, বিশ্বশান্তির জন্য মোনাজাত, প্রার্থনা, খরার দিনে বৃষ্টির জন্য মসজিদে মোনাজাত, মন্দিরে কাঁসার ঘন্টা, এগুলোর যুক্তি কতটুকু? আদৌ কোনও উপযোগিতা কি আছে? দেশে সংসদ নির্বাচন এলো আর নেতানেত্রী ছুটলেন কলিমুদ্দি-ছলিমুদ্দি-ডলিমুদ্দির মাজার জিয়ারতে। প্রতিদিন পত্রিকায় খবর, অমুক নেতা আজ সাড়ে তিন কুড়ি কবর জিয়ারত করেছেন। কিসের আলামত এসব কাজের মধ্যে? মানুষকে আলোকিত অগ্রসর চেতনায় মানুষ করা? নাকি ব্যালট বাক্সটা ভরার বন্দোবস্ত করা? হাজারো কুসংস্কারকে এভাবে হাজারো ভাবে ধর্মের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে চালানো হচেছ। অনেকে বলেন, ধর্মে কুসংস্কারের স্থান নেই, ধর্মব্যবসায়ীরা এর অপব্যাখ্যা করেন। তারা হয় ধর্মের পাতা খুলে দেখেন নি, না হয় নির্বোধ বা ধুরন্ধর চালাক। ধর্মে বলা থাকল, ছয়দিনে ব্রক্ষ্মান্ড সৃষ্টি হলো, মাটি দিয়ে আদম-হাওয়া/অ্যাডাম-ইভ্ তৈরি করে জীবন দেয়া হলো, সেখান থেকেই সব মানুষ সৃষ্টি হলো- এখন বিবর্তনবাদ বা বিগব্যাং ব্যাপারগুলোর পাশাপাশি ধর্মের ঐ সিদ্ধান্তগুলোকে কি বলবেন? ধর্মে বলা থাকল, একসাথে চারটে স্ত্রী রাখা যাবে, দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে, স্ত্রীকে ইচেছমত পিটানো যাবে, ঘন্টাখানেকের জন্য বিয়েও করা যাবে। এর পাশাপাশি মানবতাবাদ, নারী-পুরুষের সাম্য বিষয়গুলোকে কিভাবে দেখবেন? এভাবে যথেষ্ট পরিমান সর্বনাশ করার পর যদি ধর্ম বলে- সদা সত্য কথা বলবে, চুরি করবে না, দানধর্ম মহান ধর্ম, তারজন্য কি সব মাফ হয়ে গেল? সাম্প্রদায়িকতা নিয়েই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধ হয়েছে, লোকক্ষয় হয়েছে, দোষটা কার? আরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম না থাকলে তো ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ই থাকবে না। মৌলবাদকে গালি দিয়ে কি হবে? মৌলবাদীরাই যে সবচেয়ে বেশি শরীয়ত বা শাস্ত্রগ্রন্থ মানে এটা শাস্ত্র থেকেই প্রমাণ করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আছে অথচ মৌলবাদ নেই- এরকম অবস্থা কল্পনাতেই সম্ভব। কম হোক বেশি হোক, মৌলবাদী চরিত্র আছে বলেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো টিকে আছে। আপনি ধর্মের গায়ে তেল মাখাবেন আবার মৌলবাদ সাম্প্রদায়িকতাকে রুখার চিন্তা করবেন, সেটা তো সম্ভব নয়। আমাদের দেশে ধুয়ো তোলা হয়, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। অথচ, ধর্মকে যথাযথ মানতে গেলে তো রাজনীতিতে ধর্মেরই বড় স্থান দিতে হবে। কারণ, ধর্ম তো শুধু প্রার্থনা করা, নীতিবাক্য পালন করা এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এর একটি রাজনৈতিক কাঠামোও আছে। আপনার কল্পনা মত সুন্দর সুন্দর নীতিবাক্যগুলোই তো শুধু ধর্ম নয়, সব ধর্মেরই কমবেশি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক একটা কাঠামো আছে। সেই কাঠামোর বাইরে যাবার এখ্তিয়ার আপনার নেই। ধর্ম তার কাঠামোর বাইরে উদ্ভাবনী কোন বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করে না। কুসংস্কার-মৌলবাদ- সাম্প্রদায়িকতাকে অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বাড়াবাড়ির ভূমিকা আছে। আধুনিককালে কুসংস্কারকে বৈধ করার জন্য যাদুবিদ্যা যতখানি না সাহায্য করছে, তার চেয়ে বেশি সাহায্য করছে ঐ সব বিষয়ের প্রতি ধর্মীয় সমর্থন।

এজন্যেই এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কুসংস্কারমুক্তির স্বপ্ন দেখতে হলে, আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখতে গেলে, ধর্মীয়গ্রন্থ বগলদাবা করে রাখলে হবে না। এরকম স্ববিরোধিতা দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়া যায় না। অথচ আমাদের দেশেরই অনেক প্রগতিশীল বলে পরিচিত বিখ্যাত মানুষরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই স্ববিরোধিতারই চর্চা করে যাচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিষয়টা আসলেই হয় এড়িয়ে যাচ্ছেন, না হয় নাকি সুরে মিনমিন করে দুকথা বলছেন, না হয় উল্টো তার গুণ গাওয়া শুরু করছেন। বিচার মানি কিন্তু তালগাছ আমার- এই চেতনা নিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চাতো হবেই না বরং আরো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হবে। এ কথা খুব বলা যায় যে, জনগনের বহুদিনের লালিত চেতনায় আঘাত দিলে হিতে বিপরীত হবে। কিন্তু, এই হিতে বিপরীতের ভয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত পরিণতিটা কি হবে, বিষয়টি আবার ভাবতে হবে। আঘাত কথাটা শুনতে খুব সাংঘাতিক। কিন্তু ঘুরে ফিরে সেটাই করতে হবে; হতে পারে তা সুকৌশলে; তবুও আঘাত নয়, আপোষ- এই সিদ্ধান্ত মুক্তচিন্তা তথা যুক্তিবাদ প্রসারের অনুকূল নয়।

মানুষই একমাত্র মননশীল জীব। অনেকটা সময় পার করে এসেছে সে। উগ্রতা, স্পর্শকাতরতা তার যেমন আছে, সহনশীলতাও কম নেই তার চেয়ে। চেতনার সমৃদ্ধির জন্য মানুষ ধীরে ধীরে বিজ্ঞানমনষ্ক হবে। এই বিশ্বাস মানুষের প্রতি রাখতে হবে। সমাজবিজ্ঞানী মাত্রেই জানেন যে, কিভাবে বিভিন্নরকম আর্থ-সামাজিক-প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর/ আল্লা/ গড এর ধারণা, আত্মা/ অমরত্ব/ কর্মফল/ স্বর্গ/ নরক/ শেষবিচারের ধারণাগুলো এসেছে। এসব চিন্তা বা বিশ্বাসের একটা কাব্যিক বা শিল্পমূল্য থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো যে কখনই বাস্তব বা প্রমাণিত সত্য নয়- এই কথাগুলো কেন জনগণকে বলা যাবেনা? নির্বিচারে যদি মেনেই নেই যে পরকাল বা আত্মা সংক্রান্ত মতবাদ সত্য, তাহলে সমাজবিজ্ঞানী বা অনান্য শাখার বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান চর্চার কিইবা দরকার আছে? ধরাবাঁধা খান কতক কেতাব শাস্ত্রেই যদি যাবতীয় জ্ঞান থাকে এবং তা যদি প্রশ্নাতীতভাবে নির্ভুলই হয়ে থাকে, তাহলে আজকের দিনে এতসব বিচিত্র ও বহুমুখী বিষয়ক জ্ঞান চর্চার দরকারটাই বা কি? এসব কি স্ববিরোধিতা নয়? এজন্য আন্তরিকভাবে বিজ্ঞানচেতনার আন্দোলন গড়তে চাইলে অতিস্পষ্ট গলায় সত্যকথা বলার সাহস থাকা চাই। এমনকি চারিদিকে প্রতিকূল পরিবেশ থাকলেও বসে থাকা চলেনা। পরিবেশ তো আকাশ থেকে টুপ্ করে পড়বেনা, এটি তৈরী করার একটি ব্যাপারও রয়ে গেছে। আর রাষ্ট্রশক্তি এটি করবেনা। বরং তাদের প্রয়োজনে এগুলোকে উস্কিয়েই দেবে। যে দলই ক্ষমতায় যাক না কেন, তাদের ধান্ধা ভোট। ধান্ধা যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় টিকে থাকা। প্রগতিশীলদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেয়ে ধর্মে-টর্মে আঘাত করবেন এবং শেষ পর্যন্ত গদি হারাবেন- এত কুবুদ্ধি অন্ততঃ তাদের মাথায় আসবেনা। অদৃষ্টবাদী মানুষ যে প্রজা হিসেবে কতটা নিরাপদ, তা তারা যথেষ্টই জানেন বৈকি। এজন্য রাষ্ট্র ঠিক সে পর্যন্তই কুসংস্কার মুক্তির কথা বলবে, যে পর্যন্ত বললে সিংহাসন টালমাটাল হবে না, শোষণটা চলবে নির্বিঘ্নে। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যমের স্ববিরোধিতা ভয়ানক প্রকট। বিটিভি জুয়েল আইচকে এই চ্যালেঞ্জ প্রচার করার সুযোগ করে দেয় যে, পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন মানুষ যদি অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাকে একলাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। তার মানে যে ধারণাটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই চ্যালেঞ্জ তা হল, বাস্তবিকই অলৌকিক বলে কিছু নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত বলে থামলে কি চলবে? যদি প্রশ্ন আসে অমুক প্রফেট অমুক অমুক অলৌকিক কাজ করে গেছেন, (সব ধর্মেই এরকম অলৌকিক ক্ষমতার প্রফেটের কথা আছে) এসব কি অলৌকিক বলে কিছুর প্রমাণ নয়? এখানে সব রকম আবেগকে ছুটি দিয়ে বলতে হবে যে, অলৌকিক কোন কিছু যেহেতু তাত্ত্বিক বা বাস্তব কোন ভাবেই ঘটা সম্ভব নয়, তাইতা কোনকালেই ঘটেনি। তা সে যত বড় নবী-প্রফেট্-অবতারের জীবনেই ঘটুকনা কেন। কিন্তু প্রচারযন্ত্র এখানে আশ্চর্য রকম। বরং সকাল-বিকাল ক্বারী ডেকে ধর্মীয় অযৌক্তিক কাহিনীগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (?) দেয়াচ্ছেন। আগেই বলেছি আসমানী কিতাব বগলদাবা করে কুসংস্কার মুক্তি সম্ভব না। ধর্ম- অলৌকিকতা একটা অন্যটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম এত-সবতো করবেই না। ওদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে, এসব বলে-টলে রাজ্যপাট ছেড়ে একতারা বাজাবেন।

এদেশে একদল স্বপ্ন দেখছেন ইসলামী শাসনতন্ত্রের। অন্যান্য দলের বক্তব্য হলো, "ওরা রাজাকার, আলবদর, স্বাধীনতাবিরোধী, ওরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে।" এর বেশি নয়। বলছেন না যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র চলবে না। এই স্পষ্ট অবস্থানটুকু নেই। রাজনীতিতে দারুনভাবে চলছে ধর্মীয় অলঙ্করণ। মুজিব কোট- জিয়া সাফারি খুলে অনেকেই টুপি-পাঞ্জাবি শুরু করেছেন। হজ্ব-মাজার জিয়ারত-পীর পুজো, নেতাদের এখন সাংঘাতিক একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে। মডার্ণ বোরখা-ঘোমটার চ্যারিটি শো নেত্রীদের মাথায়। এরা যতোই হাক-ডাক করুন না কেন, কুসংস্কার মুক্তি চান না, প্রগতি চান না, জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন দায় এরা অনুভব করেন না। ভোটের জন্য, ক্ষমতায় যেন-তেন-প্রকারেণ টিকে থাকার জন্য এরা তো জনগনকে স্ববিরোধী কথার বারোভাজা খাওয়াবেনই।

শুরুতে বলেছিলাম, সর্ষের মধ্যে ভূতের কথা। যারা মুখে বা লেখনীতে মুক্তচিন্তার কথা, প্রগতিশীলতার কথা বলছেন এবং একই সাথে বাস্তব জীবনে বা ব্যক্তি জীবনে তার উল্টোটাই করছেন- এদের কাছে প্রগতিশীলতা একটি ফ্যাশনের ব্যাপার বই কিছু নয়। এখন এদের কাছেই যদি আলোকিত সুশীল সমাজের আশা করা হয়, সেটা নিছক আশাই রয়ে যাবে। মুক্তচেতনা বিকাশের পথে এরা একটা বড় শত্রু। মুখে মার্কস-লেনিন চিবোচ্ছেন- অথচ আপাদমস্তক মোড়া মওদুদী-শার্শিনায়। এরা যদি চেতনার পরিবর্তনের আন্দোলনের সামিল হন, তাহলে সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন এমনকি লক্ষ্যচ্যুতও হতে পারে। এই সব স্ববিরোধী তথাকথিত প্রগতিশীলদের নিয়ে নতুন ভাবনা এসেই যায়।

যুক্তিবাদী আন্দোলন বা বিজ্ঞান চেতনার আন্দোলন নিছক সমাজ সংস্কার নয়। এটি শেষ পর্যন্ত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও। হাজার হাজার অর্ধশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ যদি পূজায়-ওয়াজে-গীর্জায়-প্যাগোডায় সর্বত্র প্রচার করতে পারেন ভাববাদের অযৌক্তিক ধারনাগুলো, তাহলে প্রগতিশীলরা কেন পারবেন না সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য জনসাধারণের সামনে প্রচার করতে? আমি একজন মানুষ, যুক্তিবাদী হয়ে ঘরে

বসে থাকব, অন্য একজন মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে মুখ টেপ দিয়ে বন্ধ করে থাকলেন, তাহলে তো জনচেতনার অগ্রগতি আসবে না। যদি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে, তাহলে মাঠে নামতেই হবে। ধর্মকে "রিলিজিয়ন" না করে রেখে প্রপার্টি বা গুণ বা বৈশিষ্ট্যই করতে হবে। মনুষত্ব, মানবতা এগুলোই মানব ধর্ম। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আমাদের দেশে অন্তত কোন নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্যই প্রচন্ড। এই ধর্মে যদি কুসংস্কার থাকে, অন্ধবিশ্বাস থাকে, অলৌকিকতা থাকে, শোষণের উপাদান থাকে, অসাম্য জিইয়ে রাখার আফিম থাকে, নারী-পুরুষের অবস্থানগত-মর্যাদাগত পার্থক্য থাকে- তাহলে কেন এই বিষয়টিকে নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না? যুক্তিহীন অন্ধ ধর্মবিশ্বাসই কি তাহলে মানবজাতির চেতনা সম্মৃদ্ধির পথ? মানবচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে এসব যুক্তিহীন আবেগকে ছুটি দিতেই হবে। এক হাতে তসবীহ্‌, অন্য হাতে প্রগতি- এসব হাস্যকর চিন্তা বই কিছু নয়।

যারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করার ফলে এক কাল্পনিক বিস্ফোরণের ভয়ে হাত গুটিয়ে আছেন, অথচ মুক্তচিন্তার স্বপ্ন দেখছেন, তারা হয় কল্পনাবিলাসী, না হয় সুবিধাবাদী। ক্ষমতা বদলের মতো একদল প্রগতিশীল যাবেন এবং আরেকদল প্রগতিশীল আসবেন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বাহ্‌বা কুড়োবেন- এভাবে চললে মূলগত কোন পরিবর্তন আসবেনা। হয় সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী চিন্তা নিজে ধারণ করে জনচেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, না হয় জনচেতনার সাথে গা ভাসিয়ে দিতে হবে। প্রথমোক্ত পথ কন্টকময়, দ্বিতীয়োক্ত পথ সুবিধাবাদের। কিন্তু বাস্তব সত্য হল সময়ের স্রোতে ভেসে সময় বদলানো যায়না। সময়ের চেয়ে অগ্রসর চিন্তা করতে হবে। চেতনার বিপ্লব টুপ করে আকাশ থেকে মাটিতে পড়বেনা। কুসংস্কার মুক্তির জন্য লড়াই- চেতনার বিপ্লবের জন্য লড়াই-অসাম্যের সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই- এ এক অভিন্ন লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন। একটা বিষয়ে আন্দোলন কর্মীদের সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হবে, আর তা হলো, এসব চেতনা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া। প্রগতিশীল-মুক্তমনা মানুষদের সাথে ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায় কাজ করা সাধারন জনগনের যে বিস্তর ব্যবধান, তাকে কমিয়ে শূন্যে আনতে হবে। এই কাজে বাধা-বিপত্তি আছে, কিন্তু সাফল্যও কম নেই। কর্মী চাই এজন্য। আগেই ধরে নেয়া উচিত নয় যে, যুক্তিবাদ প্রচারে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে। কারণ, মানুষ যুক্তি মানে। উপযুক্ত যুক্তি পেলে মানুষ পুরানো বস্তাপঁচা যুক্তিকে ত্যাগ করতে পারে। সত্যনিষ্ঠ, সুস্থ চিন্তার খোরাক পেলে মানুষ গ্রহণ করে। যুক্তিবাদ বা বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের এই পথ খুব সরলরৈখিক না হলেও একেবারে দূর্গম নয়। সামান্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলার সাহস করছি।

আসুন না, আপাদমস্তক পাল্টে দেবার এক সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করি। হোক তা কৃশকায় ভাবে, হোক তা খুব বিচ্ছিন্ন ভাবে, খুব চাকচিক্যহীণ ভাবে। গাঢ় আঁধারে জোনাকীর মূল্যও তো কম নয়। ছোট ছোট এই আন্তরিক সদিচ্ছা গুলোই একদিন গণমানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন চেতনায় চিড় ধরাতে পারে- চেতনার বিপ্লব আনতে পারে।